بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ এপ্রিল, ২০১৯ মোতাবেক ১২ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকে আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম নাম হলো হযরত হোসাইন বিন হারেস। তার মা ছিলেন সুখায়লা বিনতে খুযাঈ। তার সম্পর্ক ছিল বনু মুত্তালেব বিন আবদে মানাফ-এর সাথে। তিনি তার দুই ভাই হযরত তোফায়েল এবং হযরত উবায়দার সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তাদের সাথে হযরত মিসতা বিন উসাসা এবং হযরত আব্বাদ বিন মুত্তালিবও ছিলেন। মদিনায় তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানী'র ঘরে অবস্থান করেন। রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের এর সাথে হযরত হোসাইন এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এটি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের ভাষ্য। হযরত হোসাইন বদর এবং ওহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত হোসাইন এর দুই সহোদর হযরত উবায়দা এবং হযরত তোফায়েলও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত হোসাইন এর মৃত্যু হয়েছে ৩২ হিজরীতে। তার পুত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার দুই কন্যা ছিলেন- খাদিজা এবং হিন্দ, তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ১০০ ওয়াসাক খাদ্যশস্য প্রদান করেছিলেন। এক ওয়াসাক ৬০ সা-এর সমান হয়ে থাকে আর এক সা আড়াই সের এর সমপরিমাণ বা কিছুটা কম হয়ে থাকে। অতএব এভাবে তাদের পিতার কারণে মহানবী (সা.) তাদেরকে প্রায় ৩৭৫ মন খাদ্যশস্য প্রদান করেছিলেন।

দ্বিতীয় সাহাবী যার আমি স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন, হযরত সাফওয়ান (রা.)। তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। হযরত সাফওয়ানের ডাকনাম ছিল আবু আমর। তিনি বনু হারেস বিন ফেহের গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। অপর একটি রেওয়ায়েতে তার নাম ওহায়েবও বর্ণিত হয়েছে। তার মায়ের নাম ছিল দাদ বিনতে হাজদাম, যিনি বায়যা নামে পরিচিত ছিলেন। এ কারণেই হযরত সাফওয়ানকে ইবনে বায়যাও বলা হতো। তিনি হযরত সাহাল এবং সোহায়েল এর ভাই ছিলেন। মহানবী (সা.) যে সাহাল এবং সোহায়েল-এর কাছ থেকে মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয় করেছিলেন এই দুই ভাই তারা নন। তারা অন্য দুজন ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত রাফে বিন মুআল্লার সাথে হযরত সাফওয়ানের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আর অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সাফওয়ানের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়েছিল হযরত রাফে বিন আজলানের সাথে। তার মৃত্যু সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, হযরত সাফওয়ানকে বদরের যুদ্ধে তোআয়মা বিন আদী শহীদ করেছিল আর অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হন নি, বরং তিনি বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত সাফওয়ান সম্পর্কে রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি বদরের যুদ্ধের পর মক্কা ফিরে গিয়েছিলেন। আর কিছুকাল পর পুনরায় মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেছেন বলেও রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এর যুদ্ধাভিযানে অন্তর্ভুক্ত করে আকুয়া অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার মৃত্যুর সন ১৮, ৩০ বা ৩৮ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, সব ক্ষেত্রেই এটি প্রমাণিত যে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের। হযরত মুবাশ্বেরের পিতার নাম ছিল আব্দুল মুনযের। হযরত মুবাশ্বের এর পিতার নাম ছিল আব্দুল মুনযের আর তার মাতার নাম ছিল নসীবা বিনতে যায়েদ। তিনি অউস গোত্রের বনু আমর বিন অউফ শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের এবং হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি (সা.) হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের (রা.) এবং হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদ এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। যাহোক তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই যুদ্ধেই শাহাদত বরণ করেন। হযরত সায়েব বিন আবু লুবাবা, যিনি হযরত মুবাশ্বের এর ভাই হযরত আবু লুবাবার পুত্র ছিলেন, তার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) গনিমতের মালে হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের এর অংশ নির্ধারণ করেন আর মাআন বিন আদী আমাদের কাছে তার অংশ নিয়ে আসেন। অর্থাৎ তার ভাতুষ্পুত্ররা ভাইয়ের অংশ পেয়েছে।

মদিনায় হিজরতের সময় মুহাজেরদের মধ্য থেকে হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ ও হযরত আমের বিন রাবিআ এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আর তার ভাই হযরত আবু আহমদ বিন জাহাশ কুবায় হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। এরপর মুহাজেরগণ একের পর এক সেখানে আসতে থাকেন। হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের তার দুই ভাই হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের এবং হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযেরের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত রিফা ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। মহানবী (সা.) যখন বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি (সা.) হযরত আবু লুবাবাকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করে রওহা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠান। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে রওহা মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। কিন্তু মহানবী (সা.) তার জন্য গনিমতের মাল এবং পুণ্যে অংশ নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের বনু আমর বিন অউফ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি সেসব আনসারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম বর্ণনা করেন, আমি ওহুদের যুদ্ধের পূর্বে স্বপ্ন দেখি যে, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের আমাকে বলছেন, তুমি কয়েকদিনের ভেতর আমাদের কাছে চলে আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায়। তিনি বলেন, আমি জান্নাতে। আমি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা পানাহার করি। আমি তাকে বলি যে, আপনি কি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন নি? তিনি বলেন, হ্যা কেন নয়? কিন্তু আমাকে পুনর্জিবিত করা হয়েছে। সেই সাহাবী মহানবী (সা.)-কে এই স্বপ্ন শুনালে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু জাবের শাহাদত এমনই হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন শহীদ আল্লাহ্‌র কাছে যায় এবং সেখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

আল্লামা যুরকানি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী শহীদদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, অউস গোত্রের দুই সাহাবী ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন হযরত সাদ বিন খায়সামা। কেউ কেউ বলে যে, তোআয়মা বিন আদী তাকে শহীদ করেছে আর কারো কারো মতে আমর বিন আবদে উদ তাকে শহীদ করেছে। সামহুদি তার বই 'ওফা'-তে লিখেছেন যে, জীবনি লেখকদের লেখা থেকে স্পষ্ট যে, হযরত উবায়দা ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা বদরেই কবরস্ত রয়েছেন। হযরত উবায়দার মৃত্যু কিছুকাল পর হয়েছিল আর তিনি সাফরা বা রওহা নামক স্থানে সমাহিত রয়েছেন।

তিবরানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় মহানবী (সা.) এর সেসব সাহাবী, যাদেরকে বদরের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের আত্মাকে জান্নাতে সবুজ পাখিদের মাঝে স্থান দেবেন। তারা জান্নাতে পানাহার করবে, এমতাবস্থায় তাদের প্রভু তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বলবেন যে, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কী আশা কর? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু এর চেয়েও মহান কিছু আছে কী? আমরা তো জান্নাতেই আছি। আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বলবেন যে, তোমরা কী আশা কর? প্রত্যুত্তরে চতুর্থবার সাহাবীরা বলবেন, তুমি আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দাও, যেন আমাদেরকে পুনরায় সেভাবেই শহীদ করা হয় যেভাবে পূর্বে আমাদের শহীদ করা হয়েছিল।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত ওরাকা বিন ইয়াস। হযরত ওরাকা'র নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তার নাম ওরাকা ছাড়া ওয়াদফা এবং ওয়াদকা-ও বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওরাকার পিতার নাম ছিল ইয়াস বিন আমর। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু লোযান বিন গানাম শাখার সদস্য ছিলেন। আল্লামা ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ওরাকা তার দুই ভাই হযরত রবী' এবং হযরত আমর এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। হযরত ওরাকা বদরের যুদ্ধের পাশাপাশি ওহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ১১ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত মুহরেয বিন নাযলা। তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। নাযলা বিন আব্দুল্লাহ্ হলেন তার পিতা। অথচ অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তার পিতার নাম ছিল ওহাব। তার উপনাম ছিল আবু নাযলা। তিনি ফর্সা এবং সুশ্রী চেহারার অধিকারী ছিলেন। তার উপাধি ছিল ফুহায়রা। তিনি আখরাম নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বনু আবদে শামস এর মিত্র ছিলেন। অথচ বনু আব্দুল আশআল তাকে নিজেদের মিত্র বলে থাকে। অর্থাৎ মুহরেয এবং আখরাম, দুটি নাম ছিল তার। তিনি মক্কার গোত্র বনু গানাম বিন দূদান এর সদস্য ছিলেন। এই গোত্রটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এই গোত্রের পুরুষ এবং মহিলারা মদিনায় হিজরতের তৌফিক লাভ করেছে। সেসব মুহাজেরের মাঝে হযরত মুহরেয বিন নাযলাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওয়াকদী বলেন যে, আমি ইব্রাহীম বিন ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি যে, ইয়াওমুস সারহা-য় হযরত মুহরেয বিন নাযলা ব্যাতিরেকে বনু আব্দুল আশআল এর ঘর থেকে আর কেউ বের হয়নি; এটি যী কার্দ এবং গাবা'র যুদ্ধের নাম যা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলেমা'র ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, যার নাম ছিল যুল লামা'। মহানবী (সা.) হযরত মুহরেয বিন নাযলা এবং

হযরত আম্মারা বিন হাযম এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সালেহ্ বিন ওয়াকদি'র মতে সালেহ্ বিন কায়সান থেকে বর্ণিত যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা বলেন, আমি স্বপ্নে নিম্ন আকাশকে দেখি যা আমার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এপর্যায়ে আমি তাতে প্রবেশ করি আর সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যাই। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চলে যাই। আমাকে বলা হয় যে, এটি হলো তোমার গন্তব্য। হযরত মুহরেয বলেন, আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করি, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বলেন, তুমি শাহাদতের শুভসংবাদ গ্রহণ কর। এরপর একদিন তাকে শহীদ করা হয়। তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে ইয়ামুস সারাহ্-তে গাবা'র যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন। এই যুদ্ধকে যী কার্দও বলা হতো যা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। আমর বিন উসমান জাহশী নিজ পিতৃপুরুষদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তার বয়স ৩১ বা ৩২ বছর ছিল, আর তিনি যখন শহীদ হন তখন তার বয়স প্রায় ৩৭ বা ৩৮ বছর হবে।

হযরত মুহরেয এর শাহাদতের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইয়াস বিন সালামা যী কার্দ এর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন , হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার পর আমরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার জন্য বের হই। অতঃপর আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেই। আমাদের এবং বনু লেহইয়ান এর মাঝে এক পাহাড় ছিল। তারা মুশরিক ছিল। মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন যে রাতে এই পাহাড়ে চড়বে। অর্থাৎ সে যেন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের জন্য পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং নিরাপত্তার মানসে গুপ্তচরের কাজ করে। অর্থাৎ নিগরানী, নিরাপত্তার জন্য যেন ওপড়ে চড়ে আর দৃষ্টি রাখে কোথাও শত্রুরা হামলা না করে বসে। হযরত সালামা বিন আকওয়া বলেন, আমি সেই রাতে দুই বা তিনবার পাহাড়ে চড়ি। এরপর আমরা মদিনায় পৌঁছি। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) রাবাহ্ নামের ব্যক্তির হাতে নিজের উট প্রেরণ করেন, যে মহানবী (সা.) এর দাস ছিল। আর আমি হযরত তালহার ঘোড়া নিয়ে তাতে চড়ে বের হই। আমি সেটিকে উটের সাথে পানি পান করানোর জন্য যাচ্ছিলাম। যখন সকাল হয় তখন আব্দুর রহমান ফাযারি মহানবী (সা.) এর উটের ওপর আক্রমণ করে। এটি পার্শ্ববর্তী একটি শত্রু গোত্র ছিল। তারা সব উট হাকিয়ে নিয়ে যায় এবং সেগুলোর রাখালকে হত্যা করে। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি বললাম- হে রাবাহ্! এই ঘোড়া নাও আর এটিকে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্'র কাছে পৌঁছে দাও। আর মহানবী (সা.) কে এই সংবাদ দাও যে, মুশরিকরা আপনার পশু লুট করে নিয়ে গেছে। এরপর আমি মদিনার দিকে মুখ করে একটি টিলার ওপর দাঁড়াই আর তিনবার ডাকি- ইয়া সাবাহা, ইয়া সাবাহা। এই বাক্য আরবরা তখন বলতো যখন কোন ছিনতাইকারী ও হত্যাকারী শত্রু সকালে আসতো ,তখন (মানুষ) এ শব্দে নারাহ্ উত্তোলন করতো অর্থাৎ উদাত্ত কণ্ঠে ডাকতো আর সাহায্যের জন্য আহ্বান করতো যেন নিজ পক্ষের লোকেরা তৎক্ষণাৎ এসে শত্রুর মোকাবেলা করে আর শত্রুকে তাড়িয়ে দেয়। কারো কারো মতে, যুদ্ধে লিপ্ত পক্ষগুলোর রীতি ছিল, রাত হতেই তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিত এবং নিজেদের ঠিকানায় ফিরে যেত। আর সাবাহা সম্পর্কে একটি দ্বিতীয় রেওয়ায়েত হলো সাবাহা বলে পরের দিন যোদ্ধাদের অবহিত করা হতো যে, সকাল হয়ে গেছে এখন পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। লুগাতুল হাদীস গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, যাহোক

এরপর আমি তাদের সন্ধানে এবং তাদেরকে তির মারতে মারতে বের হই, আর আমি রণসঙ্গীত পাঠ করছিলাম এবং বলছিলাম যে,

আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযা

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটি হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। অতএব আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই দেখতাম তার হওদাতে তির মারতাম। এমনকি তিরের ফলা বের হয়ে তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমি বলতাম, এই নাও, **আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযা**। অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটি হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম, আমি তাদের তির মারতে থাকি আর তাদের আহত করতে থাকি। যখন আমার দিকে কোন অশ্বারোহী আসতো তখন আমি কোন গাছের ছায়ায় এসে এর নিচে বসে পড়তাম, অর্থাৎ লুকিয়ে পড়তাম। আর আমি তাকে তির মেরে আহত করে দিতাম। এমনকি যখন পাহাড়ী পথ সরু হয়ে যায় আর তারা সেই সরু পথে প্রবেশ করে তখন আমি পাহাড়ে আরোহন করি আর তাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকি। অর্থাৎ যারা মহানবী (সা.) পশুপাল লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের ওপর তিনি একাই আক্রমণ করেন কেননা তিনি একা ছিলেন। প্রথমে তিনি তির মারতে থাকেন এরপর বলেন যে, গিরিপথে পৌঁছে সেখান থেকে আমি পাথর বর্ষণ আরম্ভ করি। এভাবেই আমি তাদের পিছুধাওয়া করতে থাকি, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) উটগুলোর মাঝ থেকে এমন কোন উট রাখেন নি যেটিকে আমি নিজের পেছনে না ফেলে দিয়েছি। অর্থাৎ গিরিপথের কারণে সেগুলো পেছনে রয়ে যায় আর তারা সামনে চলে যায়, তারা সেগুলোকে আমার এবং তাদের মাঝখানে ছেড়ে চলে যায়। এরপর আমি তির চালানো অব্যাহত রাখি। এমনকি তারা ত্রিশটির অধিক চাদর এবং ত্রিশটি বর্শা ওজন হালকা করার উদ্দেশ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। অর্থাৎ তারা যেহেতু পালাচ্ছিল, উট তো পূর্বেই ছেড়ে দিয়েছিল, এখন নিজেদের জিনিসপত্রও পেছনে ফেলে যেতে থাকে যেন সহজে দৌঁড়াতে পারে। তিনি বলেন, তারা যে জিনিসই ফেলে যেতো, আমি সেগুলোর ওপর চিহ্ন হিসেবে পাথর রেখে দিতাম যেন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা তা চিনতে পারেন। এমনকি তারা একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছে, যেখানে তারা বদর ফাযারি'র কোন পুত্রকে পায়। তারা সেখানে বসে খাদ্য গ্রহণ আরম্ভ করে। আমি একটি চূড়ায় বসেছিলাম। ফাযারি বলে যে, এই ব্যক্তি কে, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। তারা বলে, এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। খোদার কসম, সে সকাল থেকে অনবরত আমাদের ওপর তিরন্দাজি করে যাচ্ছে। এমনকি সে আমাদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। সে বলে যে, তোমাদের মাঝ থেকে চার ব্যক্তির তার দিকে যাওয়া উচিত। হযরত সালামা বিন আকওয়া বলেন, তাদের মাঝ থেকে চারজন আমার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে চড়ে। যতটা নিকটবর্তী হলে আমি কথা বলতে পারতাম যখন তারা আমার ততটা নিকটবর্তী হয়, আমি তাদের বলি, তোমরা কি আমার সম্পর্কে জান? তারা বলে যে, না, তুমি কে? আমি বললাম যে, আমি সালামা বিন আকওয়া। এরপর তিনি সেই কাফেরদের বলেন যে, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন, আমি তোমাদের মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা ধরতে পারি। কিন্তু তোমাদের মাঝ থেকে কেউ যদি আমাকে পাকড়াও করতে চায় তাহলে তা পারবে না। যে চারজন এসেছিল তাদের একজন কিছুটা ভয় পেয়ে যায় এবং বলে যে, আমারও একই ধারণা। এরপর তারা চারজনই ফিরে যায়। আমি আমার নিজের স্থানে বসে থাকি। এমনকি আমি মহানবী (সা.) এর ঘোড়াগুলোকে গাছপালার মাঝ

দিয়ে আসতে দেখি। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম ছিলেন আখরাম আসাদী আর তার পিছনে ছিলেন আবু কাতাদা আনসারী। আর তার পিছনে ছিলেন মিকদাদ বিন আসওয়াদ কিন্দি। আমি আখরাম অর্থাৎ হযরত মুহরেয এর ঘোড়ার লাগাম ধরি। তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চতুর্দিকে পালিয়ে যায়। এখানে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। আমার মনে হয়, সেখানে বসে অন্য যারা খাবার খাচ্ছিল, যখন তারা দেখে যে, তিনি আরো নিকটবর্তী হয়ে গেছেন তখন তারাও পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আখরাম, অর্থাৎ মুহরেযকে বলেন যে, যতক্ষণ মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ পৌঁছে না যান, তুমি আত্মরক্ষা কর যেন তারা তোমাকে ধ্বংস না করে দেয়। তিনি বলেন, হে সালমা! যদি তুমি আল্লাহ্ তা'লা এবং শেষ দিবসে ঈমান রাখ আর তুমি জান যে, জান্নাত সত্য এবং অগ্নি অর্থাৎ জাহান্নাম সত্য, তাহলে তুমি আমার এবং শাহাদতের মাঝে প্রতিবন্ধক হইও না। আমি তাকে ছেড়ে দেই। এমনকি তিনি অর্থাৎ আখরাম এবং আব্দুর রহমান পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তিনি আব্দুর রহমানসহ তার ঘোড়াকে আহত করেন। আব্দুর রহমান তাকে অর্থাৎ আখরাম বা হযরত মুহরেযকে বর্শা মেরে শহীদ করে দেয় এবং তার ঘোড়ায় আরোহন করে নিজ লোকদের মাঝে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। তখন মহানবী (সা.) এর সাথে যারা আসছিল তাদের মাঝ থেকে একজন অর্থাৎ মহানবীর দক্ষ অশ্বারোহী আবু কাতাদা আব্দুর রহমানের পিছুধাওয়া করেন, এবং তাকে ধরে ফেলেন আর বর্শা মেরে তাকে হত্যা করেন। এ ব্যক্তি হযরত মুহরেযকে শহীদ করেছিল। তিনি বলেন, তাঁর কসম যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন। আমি দৌড়ানো অবস্থায় তাদের পিছুধাওয়া করতে থাকি আর তাদের পিছুধাওয়া অব্যাহত রাখি। এমনকি আমি মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীদের মাঝ থেকে কাউকে বরং তাদের ধূলাকেও নিজের পিছনে দেখতে পাই। অর্থাৎ তিনি অনেক দূর চলে যান। এমনকি সূর্যাস্তের পূর্বে তারা একটি উপত্যকায় পৌঁছে যেখানে একটি ঝর্ণা ছিল। সেটিকে যী কার্‌দ বলা হতো। অর্থাৎ সেসব লোক, যারা মাল লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা সেখান থেকে পানি পান করতে চাচ্ছিল এবং পিপাসার্ত ছিল। এরপর তারা আমাকে তাদের পেছনে দৌঁড়াতে দেখতে পায়। আমি তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেই এবং তারা সেখান থেকে এক ফোটাও পান করতে পারে নি। তারা সেখান থেকে বের হয়ে অপর একটি উপত্যকার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। আমিও দৌঁড় দেই। আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই পিছনে পেতাম, অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনে দৌঁড়াতে থাকি। আর যে-ই পেছনে রয়ে যেত তার কাঁধের হাড়ে তির মারতাম। আমি বলতাম, এই নাও, **আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযা**।

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এ দিনটি নীচ বা হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, সে বলে যে, আকওয়া লাঞ্ছিত হোক, সকালের আকওয়ার কথা বলছো? অর্থাৎ তিনি যাদেরকে আহত করছিলেন তাদের মাঝ থেকে একজন বলে যে, সেই সকালের আকওয়া যে সকাল থেকে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। আমি বললাম যে, হ্যাঁ, হে নিজ প্রাণের শত্রু! তোমার সেই সকালের আকওয়া। তারা দুটি ঘোড়া উপত্যকায় নিজেদের পেছনে ছেড়ে যায়। আমি সেগুলোকে হাকিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করি। আমি আমেরকে একটি পানির মশকে কিছুটা পানি মিশ্রিত দুধ এবং একটি মশকে পানি নিয়ে আসতে দেখি। আমি ওযু করি এবং পান করি। অতঃপর আমি মহানবী (সা.) এর কাছে আসি, আর তিনি (সা.) তখন সেই ঝর্ণার কাছে ছিলেন যেখান থেকে আমি সকালে তাদের অর্থাৎ সেই ছিনতাইকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। মহানবী (সা.) সেই পানির কাছে পৌঁছে

গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম যে, মহানবী (সা.) সেই উট এবং সমস্ত জিনিস যা আমি মুশরেকদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম, হস্তগত করেছেন। হযরত বেলাল আমি যেসব উট তাদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম সেই উটগুলোর মাঝ থেকে একটি উটনী জবাই করেন। তিনি মহানবী (সা.) এর জন্য কলিজা এবং কুঁজের মাংস নিয়ে ভুনা করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে সৈন্যবাহিনী থেকে অর্থাৎ যারা আপনার সাথে এসেছে তাদের মধ্য থেকে ১০০ লোককে নির্বাচন করার অনুমতি দিন। তাহলে আমি তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করব যেন তাদের গোত্রকে অবহিত করার মতো কোন লোকও জীবিত না থাকে। অর্থাৎ যারা এই মালামাল লুটপাট বা ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের কথা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খিলখিলিয়ে হাসেন। এমনকি আগুনের আলোয় তাঁর (সা.) দাঁত মোবারক দেখা যেতে থাকে। তিনি বলেন, হে সালামা! তুমি কি মনে কর যে, তুমি এটি করতে পারবে আর তাদের সবাইকে তাদের ঘরে পৌঁছার পূর্বেই হত্যা করতে পারবে? আমি বললাম যে, হ্যাঁ, তাঁর কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, এখন তারা গাতফান এর সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এখানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া মহানবী (সা.) এর কাছে মুশরিকদের দ্বিতীয়বার পিছু ধাওয়া করার অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) বলেন, **ইয়া ইবনাল আকওয়া, মালাকতা ফাসজে'**। অর্থাৎ হে আকওয়ার পুত্র! তুমি যখন বিজয় লাভ করেছ, যেতে দাও এবং উপেক্ষা কর। এখন তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং হত্যা করে কী লাভ। অতএব এই হলো উন্নত আদর্শ। প্রথমে তিনি একা যুদ্ধ করতে থাকেন, হযরত মুহরেয আসলে তার ওপর তারা গুপ্ত-হামলা করে এবং তাকে শহীদ করে। প্রথমে কোনভাবে তিনি তাদের ঘোড়াকে ধরে ফেলেন আর হামলা প্রতিহত করেন এবং বেঁচে যান। কিন্তু পুনরায় আক্রমণ হয় আর তিনি শহীদ হন। এটি হলো তার অর্থাৎ হযরত মুহরেয-এর শাহাদতের ঘটনা। আর দ্বিতীয় বিষয় ছিল তার বীরত্ব। এছাড়া রণকৌশল সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। অতি দক্ষতার সাথে ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে সমস্ত মাল পুনরুদ্ধার করেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ধনসম্পদ পুনরুদ্ধার করার পরও যখন তিনি বলেন যে, আমি পিছুধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করব; তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, তাদেরকে যেতে দাও। সম্পদ যেহেতু ফেরত পাওয়া গেছে তাই ছেড়ে দাও। অতএব এ হলো মহানবী (সা.) এর উন্নত আদর্শ, কেননা হত্যা বা খুন করা তাঁর (সা.) উদ্দেশ্য ছিল না। ছিনতাইকারী এবং আক্রমণকারীদের কাছ থেকে যখন তিনি সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন আর তাদের সবাই নিজেদের সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন তাদের কেউ কেউ আহতও হয়, কিন্তু তিনি সেখানে কোন প্রকার যুদ্ধ, খুন বা হত্যা করেন নি।

যাহোক তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন তাকে এসব কথা বলছিলেন যে, ছেড়ে দাও, যেতে দাও, তারা পালিয়ে গেছে, তখন বনি গাতফান এর এক ব্যক্তি আসে এবং বলে যে, অমুক ব্যক্তি তাদের জন্য উট জবাই করেছে। যখন সে উটের চামড়া ছাড়াচ্ছিল তখন সে ধূলা দেখতে পায় এবং বলে যে, তারা এসে গেছে। এরপর তারা সেখান থেকেও পালিয়ে যায়। প্রভাতে মহানবী (সা.) বলেন, আজ আমাদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী হলেন আবু কাতাদা, আর পদাতিক সৈনিকদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন সালামা। অর্থাৎ পদাতিক যোদ্ধাদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন সালামা, যিনি তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির মাঝে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে দুটি অংশ দান করেছেন। একটি আরোহীর অপরটি

পদাতিকের। এরপর মদিনা ফেরার পথে মহানবী (সা.) আমাকে আসবা উটনীর ওপর নিজের পেছনে বসান। তিনি বলেন, আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন আনসারের এক ব্যক্তি, যার চেয়ে দ্রুত কেউ দৌড়াতে পারত না, তিনি বলতে আরম্ভ করেন যে, মদিনা পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার কেউ আছে কি? যুদ্ধ এবং শত্রুদের নির্যাতন সত্ত্বেও সাহাবীরা নিজেদের বিনোদনের ব্যবস্থাও করে নিতেন। একে অপরকে হালকা চ্যালেঞ্জও করতেন যেন সময়ও কেটে যায় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে যে, স্থায়ী মানসিক চাপ থাকে তা-ও কিছুটা প্রশমিত হয়। যাহোক তিনি বলেন যে, কেউ আছে কি যে আমার সাথে দৌড়বে? এমন কোন দৌড়বিদ আছে কি? তিনি বলেন, তিনি বারবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। আমি যখন এ কথা শুনি তখন আমি সেই দ্বিতীয় সাহাবীকে রসিকতা করে বলি যে, তুমি কি কোন সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কর না, কোন বুযুর্গকে ভয় কর না? সে বলে যে, মহানবী (সা.) ব্যতিরেকে আর কাউকে নয়। অর্থাৎ মহানবী (সা.) ছাড়া আর কাউকে আমি ভয় করি না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমাকে এই ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে দিন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, যদি তুমি চাও তাহলে কর। আমি সেই ব্যক্তিকে বলি, চল প্রতিযোগিতা করি। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার পা ঘুরিয়ে লাফ দেই এবং দৌড় আরম্ভ করি। আমি এক বা দুই উপত্যকা তার পিছনে দৌড়াই। আমি নিজের শক্তি সঞ্চিত রাখছিলাম। এরপর আমি ধীরে ধীরে তার পিছনে দৌড়াতে থাকি। অতঃপর আমি গতি কিছুটা বাড়িয়ে দেই এবং তার কাছে পৌঁছে যাই। এভাবে দৌড় চলতে থাকে। সে দৌড়ের ক্ষেত্রে মদিনায় সবার চেয়ে দ্রুত মানুষ ছিল। তিনি বলেন, আমি গতি আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ধরে ফেলি এবং তার কাঁধের মাঝামাঝি ঘুষি দেই। আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি পেছনে রয়ে গেলে।

এক বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, আমি মদিনা পর্যন্ত তার সামনে ছিলাম। এরপর আমরা তিন রাত এখানে অবস্থান করি। অতঃপর মহানবী (সা.) এর সাথে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। অর্থাৎ সেখানে অবস্থানের পর খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হন। তাবরী'র ইতিহাসে এই যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসেম বিন আমর বিন কাতাদা থেকে বর্ণিত যে, যী কার্‌দ এর যুদ্ধে শত্রুদের কাছে সবার আগে হযরত মুহরেয বিন নাযলার ঘোড়া পৌঁছে, যিনি বনু আসাদ বিন হুযায়মা গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মুহরেয বিন নাযলাকে আখরামও বলা হতো। অনুরূপভাবে তাকে কুমায়েরও বলা হতো। যখন শত্রুদের পক্ষ থেকে লুটপাট এবং বিপদের আশঙ্কায় সাহাবীদের একত্রিত হওয়ার ঘোষণা আসে তখন হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা'র ঘোড়া, যা তার বাগানে বাঁধা ছিল, অন্যান্য ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি অর্থাৎ ডাক শুনতে পায় এবং নিজের জায়গায় লাফালাফি আরম্ভ করে। এটি একটি উৎকৃষ্ট এবং প্রশিক্ষিত ঘোড়া ছিল। তখন বনু আব্দুল আশআল এর মহিলাদের মাঝ থেকে কতিপয় মহিলা এই বাঁধা ঘোড়াকে এভাবে লাফাতে দেখে হযরত মুহরেয বিন নাযলাকে বলে যে, হে কুমায়ের! আপনার কি নিজের এই ঘোড়ায় আরোহনের সামর্থ্য আছে? আর এই ঘোড়া কেমন তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর তিনি গিয়ে মুসলমান এবং মহানবী (সা.) এর সাথে মিলিত হন। তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি প্রস্তুত আছি। এরপর মহিলারা সেই ঘোড়াটি তার হাতে সোপর্দ করে। তিনি অর্থাৎ হযরত মুহরেয তাতে আরোহন করে যাত্রা করেন। তিনি এই ঘোড়ার লাগাম ঢিল ছেড়ে দেন। এমনকি তিনি সেই দলের সাথে মিলিত হন যা মহানবী (সা.) এর সাথে যাচ্ছিল এবং তিনি

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যান। এরপর হযরত মুহরেয বিন নাযলা বলেন, হে ছোট্ট দল! থাম, যতক্ষণ না অন্যান্য মুহাজের এবং আনসার তোমাদের সাথে মিলিত হয়, যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুদের এক ব্যক্তি তার ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। এরপর সেই ঘোড়া অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ছুটতে থাকে এবং কেউ সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। এমনকি সেটি বনু আব্দুল আশআল এর মহল্লায় এসে সেই রশির কাছেই দাঁড়িয়ে যায় যা দিয়ে সেটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অতএব সেদিন তিনি ছাড়া মুসলমানদের আর কেউ শহীদ হয় নি। সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী সেই সাহাবীর নাম ছিল হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা। তার ঘোড়ার নাম ছিল যুল লামা'। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুহরেয বিন নাযলা শাহাদতের সময় হযরত উকাশা বিন মিহসান এর ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, সেই ঘোড়াকে জানাহ্ বলা হতো, এবং শত্রুদের কাছ থেকে কিছু পশু ছাড়িয়ে এনেছিলেন। মহানবী (সা.) নিজের স্থান থেকে যাত্রা করেন এবং যী কার্দ এর পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে বিরতি দেন। সেখানেই অন্য সাহাবীরা মহানবী (সা.) এর কাছে এসে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) এক দিন এবং এক রাত সেখানে অবস্থান করেন। সালামা বিন আকওয়া তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি একশত ব্যক্তিকে আমার সাথে প্রেরণ করেন তাহলে আমি বাকি পশুগুলোও শত্রুদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনছি এবং তাদের ঘাঁড় চেপে ধরছি। মহানবী (সা.) বলেন, কোথায় যাবে? এখন তো তারা গাতফান এর মদ পান করছে। মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে প্রতি দলে এক এক শ' করে বিভিন্ন দলে ভাগ করে তাদের মাঝে খাবারের জন্য উট বণ্টন করেন, যেগুলোকে সাহাবীরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এরপর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তাদেরকে ছেড়ে দেন বা যেতে দেন। হযরত মুহরেযই কেবল সেখানে শহীদ হন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অশ্বারোহীদের মাঝে সর্বপ্রথম শহীদ ছিলেন। আর প্রথম বর্ণনায়ও এ কথা-ই বলা হয়েছে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো, হযরত সোআয়বাত বিন সা'দ (রা.)। তাকে সোআয়বাত বিন হারমালাও বলা হয়। তার নাম সোআয়বাত বিন হারমালা এবং সালীব বিন হারমালাও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত সোআয়বাত বনু আবদে দার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল হুনায়দা। তিনি প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ জীবনি লেখকগণ তাকে ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। হযরত সোআয়বাত মদিনায় হিজরত করেন আর হিজরতের পর তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানীর গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত সোআয়বাত এবং হযরত আয়েস বিন মায়েস এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন। হযরত সোআয়বাত বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন।

হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের এক বছর পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) সিরিয়ার একটি অঞ্চল 'বুসরা'য় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তার সাথে নয়েমান এবং সোআয়বাত বিন হারমালাও সফর করেন আর তাদের উভয়েই বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। নায়েমান পাথেয় বা রসদের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সোআয়বাত রসিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি নয়েমানকে বলেন, আমাকে খাবার খাওয়াও, রশদ বা খাদ্য সামগ্রী ছিল নয়েমানের তত্ত্বধানে, কাফেলার পুরো খাবার-দাবার আয়োজনের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তিনি (অর্থাৎ সোআয়বাত) তাকে বলেন, খাবার খাওয়াও। তিনি

বলেন, আবু বকর (রা.) যতক্ষণ না আসবেন, আমি খাবার দেবো না। তিনি বলেন, তুমি আমাকে খাবার না দিলে আমি তোমাকে ক্ষেপাব। আমি পূর্বেও সংক্ষেপে এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। যাত্রাকালে তারা যখন একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সোআয়বাত তাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার এক কৃতদাসকে ক্রয় করবে? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ। সোআয়বাত সেই গোত্রের লোকদের বলেন যে, স্মরণ রেখ! এই কৃতদাস বেশি কথা বলে, আর সে এ কথাই বলতে থাকবে যে, আমি স্বাধীন। সে তোমাদেরকে এই কথা বললে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ব্যবসা খারাপ করো না। তারা উত্তর দেয় যে, না, বরং আমরা তাকে তোমার কাছ থেকে কিনতে চাই। তখন তারা দশ উটের বিনিময়ে সেই কৃতদাসকে কিনে নেয়। এরপর তারা হযরত নয়েমান এর কাছে আসে এবং তার গলায় রশি পরায়। নয়েমান বলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। আমি স্বাধীন, কৃতদাস নই। কিন্তু তারা উত্তর দেয় যে, সে তোমার সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের বলে দিয়েছিল যে, তুমি আমাদেরকে একথাই বলবে, এরপর তারা (তাকে) ধরে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন ফিরে আসেন আর লোকেরা তার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন তখন তিনি ঐ লোকদের পেছনে পেছনে যান আর তাদেরকে তাদের উটগুলো ফেরত দিয়ে নয়েমানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, (আর বলেন,) ইনি (অর্থাৎ নয়েমান) কৃতদাস নন বরং স্বাধীন, উনি (অর্থাৎ সোআয়বাত) ঠাট্টা করেছিল। সাহাবীদের মধ্যে এ ধরনের হাসি-ঠাট্টার রীতিও ছিল। যাহোক, যখন এরা ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে হাজির হয় এবং তাঁকে এ ঘটনা বলেন, বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এক বছর পর্যন্ত এ ঘটনা উপভোগ করেন। মহানবী (সা.)'ও এ ঘটনায় খুব হাসেন আর এক বছর ধরে কৌতুকটি জনপ্রিয় ছিল। যাহোক, একটি ব্যতিক্রমসহ উপরোক্ত ঘটনা এভাবেও দেখা যায়, বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা আছে যে, হযরত সোআয়বাত নন বরং হযরত নয়েমান বিক্রেতা ছিলেন।

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের পর আমি যে কথা সংক্ষেপে বলতে চাই তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি এলহাম **"ওয়াস্‌সে মাকানাকা"** (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর) সম্পর্কিত। এই এলহাম বিভিন্ন সময়ে তাঁর (আ.) প্রতি হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, শুরুতে যখন আল্লাহ্ তা'লা **"ওয়াস্‌সে মাকানাকা"**র এলহাম করেন তখন হয়ত কেবল দুই-তিনজন মানুষই আমার বৈঠকে আসতো, এছাড়া আর কেউ আমাতে জানতো না। এরপর বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য এলহামের সাথেও **"ওয়াস্‌সে মাকানাকা"**র এলহামটি হয়েছে। অর্থাৎ নিজের গৃহ বা আবসনের সম্প্রসারণ কর। এর সাথে অন্যান্য যে এলহাম হয়েছে তাতে বিভিন্ন সুসংবাদ এবং বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র কৃপারাজি বর্ষিত হওয়ারও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ নবীদের এলহামের মাধ্যমে কোন নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি কর, তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য সাহায্য ও সহযোগিতাও করবেন আর উপকরণেরও ব্যবস্থা করবেন, এভাবে একাজ সম্পন্ন হবে- এটিই আমাদের অভিজ্ঞতা। জামা'তের ইতিহাস আমাদের বলে যে, কত মহিমার সাথে আল্লাহ্ তা'লা এই এলহাম পূর্ণ করেছেন আর এখনও পূর্ণ করে চলেছেন। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তুচ্ছ দাস, আমাদেরকেও বিভিন্ন সময়ে এই এলহাম পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে চলেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি এলহাম এবং কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার তাঁকে নির্দেশ প্রদান অথবা ভবিষ্যদ্বাণীর আদলে অবহিত করা মূলত তাঁর মাধ্যমে মহানবী

(সা.)-এর ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের প্রচার এবং উন্নতির সুসংবাদ আর তাঁর তিরোধানের পর খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর বাণীকে বিশ্বময় বিস্তারের সুসংবাদ বটে। অতএব অগ্রপানে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অথবা যে উন্নতি আমরা দেখি তা মূলত আল্লাহ্ তা'লার এই পরিকল্পনারই অংশ যা আল্লাহ্ তা'লা জগৎময় ইসলামের প্রচারের জন্য হাতে নিয়েছেন।

এই ভূমিকার পর আমি পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এলহাম **"ওয়াস্‌সে মাকানাকা"** (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত কর) এর দিকে আসছি। এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে খিলাফতের হিজরতের পর, যুক্তরাজ্যে, ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায় এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে জামা'তের প্রসারের পাশাপাশি জামাতের কেন্দ্র ও স্থাপনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জায়গা প্রদান করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে যখন এখানে হিজরত করেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণভাবে স্বীয় সাহায্যের নিদর্শন দেখান আর জামা'ত ইসলামাদে ২৫ একর জমি ক্রয় করার তৌফিক লাভ করে। এরপর এতে আরো ৬ একর যুক্ত হয়, যেখানে (দীর্ঘদিন) জলসাও হতো আর জামা'তের কর্মচারী এবং ওয়াকেফীনদের জন্য কিছু বাসস্থানেরও সুবিধা ছিল। খলীফাতুল মসীহ্র থাকার জন্য একটি বাংলোও ছিল, কয়েকটি অফিসও ছিল। একটি ব্যারাকরূপী জায়গা ছিল যেখানে মসজিদ বানানো হয়েছিল। আমার স্মরণ আছে একবার ১৯৮৫ সনে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, "কেন্দ্রের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খুবই চমৎকার একটি জায়গা দান করেছেন"। হুবহু এই বাক্য না হলেও মোটামুটি শব্দ এগুলোই ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং বিভন্ন স্বাক্ষ্যপ্রমাণও এর সত্যায়ন করে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র এখানে যথারীতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল। যাহোক, প্রতিটি কাজের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে নতুন নির্মাণ কাজের তৌফিক দিয়েছেন। উত্তম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কয়েকটি অফিস বানানো হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যুগ খলীফার জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াকেফে যিন্দেগী ও কর্মচারীদের জন্যও কিছু গৃহ নির্মিত হয়েছে, আরও কিছু নির্মিত হবে। লণ্ডনে আবাসগৃহ অফিসে রূপান্তরিত করে সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল আর খুবই ছোট্ট কক্ষে কষ্টে-সৃষ্টে কাজ হচ্ছিল। কাজের বিস্তৃতির কারণে জায়গা খুবই ছোট হয়ে যায়। এছাড়া কাউন্সিলও আপত্তি করতে যে, এসব গৃহ আবাসনের জন্য বানানো হয়েছে অথচ তোমরা অফিস বানিয়ে রেখেছ, এখান থেকে অফিস তুলে দাও। বিভিন্ন সময়ে সচরাচর এ ধরনের আওয়াজ উত্থিত হতো। এখন এই নির্মাণের ফলে এখানে (অর্থাৎ, লণ্ডনে/মসজিদ ফযলের পাশে) বিভিন্ন বাড়িতে যে তিন-চারটি অফিস ছিল তা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবে। অনুরূপভাবে ইসলাবাদের পাসেই ফার্নহামে একটি বেশ বড় দ্বিতল বিল্ডিংও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে দান করেছেন যা ইসলামাবাদ থেকে ২/৩ মাইল দূরত্বে অবিস্থত, সেখানে (রাকীম) প্রেস কাজ করছে, এছাড়া কয়েকটি অফিসও রয়েছে। এছাড়া এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়াও বড় একটি বিল্ডিং ক্রয় করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সেই সাথে ইতিপূর্বে জলসাগাহের জন্য (ইসলামাবাদের) অদূরে দুশতাধিক একর বিশিষ্ট হাদীকাতুল মাহদী ক্রয় করারও আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিয়েছেন। এরপর লন্ডনে যে জামেয়া ছিল তা-ও এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে আর জামেয়ার বর্তমান জায়গা অকল্পনীয় কম

মূল্যে আর উত্তম পরিবেশে এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধাসজ্জিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। এ ভূমির মোট আয়তন হলো প্রায় ৩০ একর। এই সমস্ত জায়গা ইসলামাবাদ থেকে ১০ থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। ইসলামাবাদের বর্তমান প্রকল্পের সাথে এসব জায়গা ক্রয় করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। এসবই আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় ছিল। এই সকল জায়গা, এক এলাকায় কাছাকাছি, একত্র হতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লা কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য জায়গাগুলোরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জামেয়াও (কেন্দ্রের) নিকটে থাকা আবশ্যক। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এসব জায়গা, এসব স্থাপনার এক এলাকায় একত্রিত হওয়া সকল অর্থে কল্যাণময় করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, যুগ খলীফার বাসস্থান এবং অফিসও সেখানে নির্মিত হয়েছে। বড় মসজিদও নির্মিত হয়েছে। তাই আমিও লণ্ডন থেকে কয়েকদিনের মধ্যে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবো, ইনশআল্লাহ্। দোয়া করুন স্থানান্তরের পর সেখানে অবস্থানও যেন সবদিক থেকে কল্যাণময় হয়। আল্লাহ্ সর্বদা কৃপা করুন। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদ থেকে ইসলামের প্রচারের কাজকে পূর্বের তুলনায় আরো ব্যপকতা দান করুন। **"ওয়াসসে মাকানাকা"** কেবল গৃহায়নের ক্ষেত্রে বিস্তৃতির কারণ যেন না হয় বরং আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যেন প্রসারতার মাধ্যম হয়। এখানে একথাও সুস্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, মসজিদ ফযলের প্রতিবেশীদের মসজিদে আগমনকারী আহমদীদের কারণে এবং ট্রাফিক ও পার্কিং এর কারণে কষ্ট ও অভিযোগ ছিল। এজন্য নতুন জায়গায় (অর্থাৎ ইসলামাবাদে) প্রতিবেশীদের এবং এলাকার লোকদের নামাযের জন্য বা এমনিতেও যারা ইসলামাবাদে আসবেন তারা তাদেরকে কোন প্রকার অভিযোগের সুযোগ দিবেন না। (ইসলামাবাদের) আশেপাশের লোকেরা আসবেন, ট্রাফিক আইন মেনে চলা আর সাবধানতার বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিগোচর রাখুন। জুমুআর নামাযের যতটুকু সম্পর্ক আছে আমি সচরাচর এখানে অর্থাৎ বায়তুল ফুতুহ্'তে এসে জুমুআর নামায পড়াবো। আমীর সাহেবকে আমি বলেছি, তিনি রীতিমত পরিকল্পনা করে জামাতসমূহকে জানিয়েও দিবেন যে, কারা বা কোন কোন জামা'ত ইসলামাবাদে জুমুআ পড়বেন বা সেখানে কারা জুমুআ পড়বে! সেখানকার পার্শ্ববর্তী জামা'তগুলোই হবে, তাদের মধ্য হতে যারাই পড়তে চাইবেন তারা সেখানে গিয়ে (নামায) পড়তে পারবে। কোন্ কোন্ এলাকার লোক হবে আর এর বণ্টন কেমন হবে (তা আমীর সাহেব জানিয়ে দিবেন)। ইসলামাবাদের ২০ মাইলের ভিতর বসবাসকারীরা সেখানেই সমবেত হতে পারেন এবং জুমুআ পড়তে পারেন। যাহোক, বিস্তারিত আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জামা'তের কর্মকর্তাগণ পেয়ে যাবেন। ২০ মাইলের বাইরের যারা সেখানে জুমুআ পড়বে তাদের সম্পর্কেও জানা যাবে যে, সেগুলো কোন্ কোন্ জামা'ত অথবা কীভাবে তাদের বিন্যস্ত করা হবে। যাহোক, পুনরায় আমি একথাই বলবো যে, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এই পরিকল্পনা এবং সেখানে স্থানান্তরকে সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন।